বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.002

বাংলার দড়ি : প্রযুক্তি ও ইতিহাস

মো. শাহিনুর রশীদ*

সারসংক্ষেপ

স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে সমাজের কাঠামো ও স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্ট হয়। এর ব্যত্যয় হলে ঐ অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস-চর্চা ব্যাহত হয়। এজন্য স্থানীয় উৎপাদনের কৃৎ-কৌশল বা প্রযুক্তির ইতিহাস-চর্চা সারা বিশ্বেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অথচ বাংলার সামাজিক ইতিহাসে প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ করা হয়নি বললেই চলে। সচেতনভাবে বাংলার ইতিহাস পড়ে প্রতীয়মান হয় না– বাংলার মানুষ বা তাদের জীবন কখনোই প্রযুক্তিহীন ছিল। যেমন, প্রাচীনযুগ বা তার পূর্ব থেকেই বাংলার ধন উৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল কৃষি-কর্ম ও বাণিজ্য। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়নি– কী উপায়ে ভূমি-কর্ষণ, বীজ-সংরক্ষণ, ধান থেকে চাউল, তৈল-নিষ্কাশন করা হতো। বাস্তু নির্মাণের কী উপায় ছিল? জলযান নির্মাণ ও চলাচলে কোন কৌশল বা প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতো? একইভাবে মানুষের গৃহস্থালি, কৃষি, বাণিজ্য বা উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় প্রতিটি ধাপে যে-দড়ির ব্যবহার ছিল অত্যাবশ্যক, সেই দড়ি কী কী উপকরণ দিয়ে তৈরি হতো, কারা তৈরি করত, তৈরিতে কী ধরনের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার হতো, এই উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজে কতটা প্রভাব ফেলেছিল– প্রভৃতি বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ব্যাখ্যাত হয়নি। মূলত তথ্যের সংকট ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি ‘বাঙালির জ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা’কে ইতিহাসের ‘বিষয়’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা দিয়েছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে বাংলার সনাতন জীবন ব্যবস্থায় দড়ির ব্যবহার, উপকরণ, উৎপাদন কৌশল, তার কার্যকারিতা ও এর ইতিহাস অন্বেষণ করা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

চাবি শব্দ : বাংলা, দড়ি, বাঁধন, পাট, শন, প্রযুক্তি, ইতিহাস।

ভূমিকা

আবহমান কাল থেকে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার অধিকাংশ কাজে কোনো না কোনোভাবে দড়ি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই ‘আধুনিক’ যুগেও এর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষণীয়। সনাতন জীবনের গৃহস্থালি, কৃষি, যোগাযোগ, শিকার, বাণিজ্য, উৎপাদন প্রভৃতি কাজের অধিকাংশ সংযুক্তিকরণে দড়ির ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। তাই এর উপকরণ নির্বাচন, উপকরণকে উপযোগীকরণ, দড়ি প্রস্তুতকরণ ও বিপণনে সমাজের একাংশ যে নিয়োজিত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের কর্মকাণ্ড একদিকে স্বীয় চাহিদা পূরণ ও অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি আয়ের উপায়ও ছিল; যা সমাজের সম্পদ বৃদ্ধির ও আর্থিক উন্নয়নেরও সহায়ক হয়েছে। অথচ এসব বিষয়, বিশেষত দড়ির মতো ‘তুচ্ছ’ বিষয়– একসময় ইতিহাস চর্চায় ‘সামাজিক’ বিষয়াবলি অবহেলিত ছিল বলে, তথ্যের ঘাটতির

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

কারণে এবং এখন পর্যন্ত ইতিহাসের বিষয় নির্বাচনে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।[১] সংশ্লিষ্ট প্রশ্নও উত্থাপিত হয়নি। যদিও জনগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতো, তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল, সামজিক সম্পর্ক কীরূপ ছিল– প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থাপন ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধে ‘বাংলার দড়ি’কে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উৎসগত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে ইতিহাস অনুসন্ধানের বিকল্প পদ্ধতি ও উৎসকে সাহায়ক বিবেচনা করে বাংলার দড়ির ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। হয়ত সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে।

গবেষণার বিষয়ের যৌক্তিকতা ও লক্ষ্য

বাংলার বস্তুসংস্কৃতি, প্রযুক্তির ইতিহাস, উৎপাদন-ব্যবস্থার আলোচনায় দড়ি অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত একটি বিষয় হলেও বিশ্বের অন্যত্র অনালোচিত নয়। যেমন, ‘Knots and Everything’ সিরিজে মোট ১৬টি খণ্ড পৃথক শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে J. C. Turner এবং P. van de Griend সম্পাদিত ১১ নম্বর খণ্ডের শিরোনাম *History and Science of Knots,* গ্রন্থটি মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাচীন প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন– ‘গিঁট’-এর ইতিহাস, ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক বিকাশ নিয়ে একটি আন্ত-জ্ঞানকাণ্ডীয় প্রকাশনা। এতে প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগের গিঁট, ইউরোপবহির্ভূত ঐতিহ্য, ব্যবহারিক বা কর্মভিত্তিক গিঁট, গিঁটবিজ্ঞানের বিকাশ ও অলংকারধর্মী গিঁটের ব্যবহার বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক, গণিতবিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানীসহ সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের ১৮টি গবেষণা একত্র হয়েছে। গিঁট কেবল দড়ি বাঁধার একটি কৌশল নয়; বরং মানব সমাজের প্রযুক্তি, নৌপরিবহণ, মাছধরা, জীবনরক্ষা, বস্ত্রশিল্প, অলংকরণ ও গণিতের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি সাংস্কৃতিক উপাদান– তা এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, প্রাচীন নিদর্শন, যেমন বরফে সংরক্ষিত ‘আইসম্যান’-এর ব্যবহৃত গিঁট, চীনা গিঁটশিল্প, পেরুর কুইপু (quipu) এবং ইনুইট জনগোষ্ঠীর গিঁটচর্চা আলোচনার মাধ্যমে এর বৈশ্বিক বিস্তার তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে ১৮ শতক থেকে আধুনিক গিঁট তত্ত্বের বিকাশ এবং এর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি গিঁটকে বস্তুগত সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সংযোগস্থলে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উদ্ভাবন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[২]

দড়ি বিষয়ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই *Handbook of Fibre Rope Technology,* এটি দড়ি প্রযুক্তির একটি বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলভিত্তিক নির্দেশিকা। বইটিতে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু থেকে তৈরি দড়ির গঠন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দড়ির টেনশন, ঘর্ষণ, স্থিতিস্থাপকতা, শক্তি সহনশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দড়ির গঠনগত বিন্যাস কীভাবে তার কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এছাড়া সামুদ্রিক কাজ, পর্বতারোহণ, শিল্পক্ষেত্র, উদ্ধার অভিযান এবং নির্মাণে দড়ির নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে দড়ির উন্নয়ন ও নতুন উপকরণ উদ্ভাবনের দিকও তুলে ধরা হয়েছে। সার্বিকভাবে, বইটি দড়িকে কেবল একটি যান্ত্রিক উপকরণ নয়, বরং একটি জটিল প্রকৌশলগত ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করে, যা নকশা, উপাদান এবং ব্যবহারগত শর্তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।[৩]

প্রাচীন সভ্যতা বিশেষ করে মিশরীয় সংস্কৃতিতে দড়ির ব্যবহার, উৎপাদন, উপকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়, K. R. Gilbert রচিত 'Rope-Making' নিবন্ধে।[৪]

এই প্রেক্ষাপটে বাংলা অঞ্চলের দড়ির ইতিহাস জানা জরুরি। তবে বাংলার মানুষ দূর অতীতে দড়ি ব্যবহার করত কী না এবং তার উত্তর হ্যাঁ অথবা না– শুধু এতটুকু জানার জন্য এরকম প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো গুরুত্ব নেই। বরং একটি সমাজ কতটা উন্নত, প্রযুক্তি ব্যবহারে কতটা অভ্যস্ত, ব্যবহৃত প্রযুক্তি কীভাবে তাদের জীবন ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে ইত্যাদি প্রশ্ন সমকালীন সমাজের কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস জানতে সাহায্য করে। তাই সামাজিক ইতিহাস চর্চায় সামাজিক প্রযুক্তির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ[৫] বিষয়।

বর্তমানে 'মধ্যযুগীয় রীতি', 'প্রাচীন পদ্ধতি', 'সনাতন প্রথা' প্রভৃতি নেতিবাচক প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ কী– তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে বাংলার মানুষ সত্যই মূর্খ, গেঁয়ো, প্রযুক্তিহীন জীবন-যাপন করত কিনা– সেটা বাংলা সনাতন প্রযুক্তি'র অধ্যয়ন ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তাই আমাদের পূর্বসূরিরা কতটা 'জ্ঞানহীন' ছিলেন, তা জানার জন্যও প্রযুক্তির ইতিহাস-চর্চা আবশ্যক।

টেকসই জ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্য শুধু বর্তমানের সমাধান নয়; বরং অতীত ঐতিহ্য অনাগতদের জন্য সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা। এজন্য অবশ্যই প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অতীত স্তরের উপযোগিতার সাথে পরিচয় থাকা; প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সেই অতীত স্তরের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কতটা টেকসই তা জানা। কার্যত এরপরই অতীতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং অধিক উপযোগী ও টেকসই করা সম্ভব, নতুবা নয়। 'কেননা ইতিহাস এমন একটি 'ডিসিপ্লিন' বা বিষয়, যা মানুষের সামাজিক সত্তা, সমাজের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দেয়। .... অতীত বিষয়ে আমাদের জ্ঞানই কিন্তু বর্তমান বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেয়। সুতরাং অতীত বলতে কী বুঝছি, কী জানছি, সেটা আমাদের স্থির করতে হবে খুব সতর্কভাবে।'[৬] অতএব, বাংলা অঞ্চলে ব্যবহৃত দড়ি সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য ও জ্ঞান-প্রযুক্তির ইতিহাস অন্বেষণ মোটেও অযৌক্তিক নয়। তাই এই গবেষণার লক্ষ্য বাংলা অঞ্চলে ব্যবহৃত দড়ি প্রযুক্তির ইতিহাস অন্বেষণ।

গবেষণা-পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রথমে বাংলার বাইরে দড়ির ব্যবহারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর বাংলার দড়ির স্থানীয় নাম ও উপকরণ; দড়ি তৈরিতে ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতির সাধারণ পরিচিতি এবং যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের প্রযুক্তিগত দিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর সে-প্রযুক্তির ইতিহাস অন্বেষণ করা হয়েছে, তবে তা নিকট অতীত থেকে ক্রমান্বয়ে দূর অতীতে বিস্তৃত হয়েছে।[৭] উক্ত প্রযুক্তিকে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কার্যত মাঠ পর্যায়ে উৎপাদক ও ব্যবহারকারীর

ব্যবহৃত পদ্ধতি ও ব্যবহৃত প্রযুক্তির বিবরণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপনে ঐতিহাসিক গবেষণা রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত ভৌত-প্রত্ন নিদর্শন ও সমকালীন সাহিত্যের পাশাপাশি প্রত্ন-শব্দ (Archaeo-word) ও সেসব শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক (Etymologycal) তথ্য ও তাদের সামাজিক ব্যাখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো সারা বাংলায় সমীক্ষার অভাব। বাংলায় এমন কোনো সমীক্ষা হয়নি, যা থেকে সমকালীন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বিকল্প হিসেবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং 'লিটলম্যাগ'-এ প্রকাশিত বা লোকসংস্কৃতির আলোচনা থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু আঞ্চলিক বিবরণ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন উপকরণের কত মোটা দড়ি কতটা টান সহ্য করতে পারে, কতটা প্রসারিত হয়, পানিতে কত দিন টেকসই– প্রভৃতিও পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সমাজ বিবর্তনে দড়ি ও দড়ি প্রযুক্তির প্রভাবও আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে বিদ্যমান প্রবন্ধে দড়ির ইতিহাস 'স্বীকৃত' হলে কীভাবে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ স্থানীয় তন্তুজাত সম্পদের প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে, সেই সম্পদের ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান কিভাবে বিকশিত হয়, প্রযুক্তিগত জ্ঞান কিভাবে দড়ি উৎপাদনের রূপ নির্ধারণ করে, উৎপদিত দড়ি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহৃত হয়'– প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ নতুন গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হবে।

সংজ্ঞা

এক বা একাধিক তন্তুকে পাক দিয়ে, এরূপ দুই বা ততোধিক পাকানো তন্তুকে আবার উল্টো করে পাকিয়ে তন্তুর দীর্ঘ যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা হলো সুতা বা দড়ি (চিত্র ১)। তবে সুতা ও দড়ির মধ্যে পার্থক্য হলো এর পুরুত্বে ও ব্যবহারে। সুতা সরু, অধিক মসৃণ ও সূক্ষ্ম বুননে ব্যববহৃত হয়। অপর দিকে দড়ি সুতার তুলনায় মোটা, অপেক্ষাকৃত অমসৃণ ও প্রধানত কোনো কিছু বাঁধা বা টানার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতার তুলনায় দড়ি অধিক শক্তি বা টান সহ্য করতে পারে। যদিও জোসেফ নিডহ্যামের সংজ্ঞা অনুযায়ী দুই সেন্টিমিটারের অধিক পরিধির হলে তা দড়ি আর এর কম হলে তা সুতা নামে অভিহিত হবে।[৮]

দড়ির সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র একক হলো তন্তু বা আঁশ (Fibre)। একাধিক তন্তু পাক (Twist) দিয়ে তৈরি হয় *ত্যাঁত্যা* বা *লোয়া*[৯] (Yarn) (চিত্র ১)। অনেক অঞ্চলে এটি *সুতলি* বা *গোছ্* নামেও পরিচিত। একটি দড়িতে কমপক্ষে দুটি *লোয়া* বা *ত্যাঁত্যা* থাকে। অনেক সময় চারটি *লোয়া* বা *ত্যাঁত্যা*র সমন্বয়েও দড়ি তৈরি হয়। আবার এরকম তিন বা ততোধিক দড়ি সহযোগে মোটা দড়ি প্রস্তুত করা হয়। লোয়া বা ত্যাঁতার গুটিয়ে রাখা গুচ্ছ বাটি, কুই, গুটি প্রভৃতি নামে পরিচিত। দড়ি প্রস্তুতকারী 'দড়্যা'[১০] নামে পরিচিত।

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাতেও দড়ির পাক দুই ধরনের হয়। একটি ডান হতে বাঁয়ে অপরটি বাঁ হতে ডানে, যা যথাক্রমে জেড (Z) ও এস (S) প্যাটার্ন নামেও পরিচিত। প্রধানত হাতিয়ারের ভিন্নতার কারণে বাংলার দড়ির পাকের ভিন্নতা হয়। দড়ির পাক মূলত *লোয়া* বা *ত্যাঁতা*'র পাকের ওপর নির্ভর করে– লোয়ার পাক যেদিকে দড়ির পাক উল্টো দিকে হয়। আবার

যখন একাধিক দড়ির (তখন এই দড়ির নাম সুতলি/Strand) সমন্বয়ে যখন মোটা দড়ি তৈরি করা হয়, তখন আবার তা লোয়ার পাকের দিকে থাকে (চিত্র ২)।

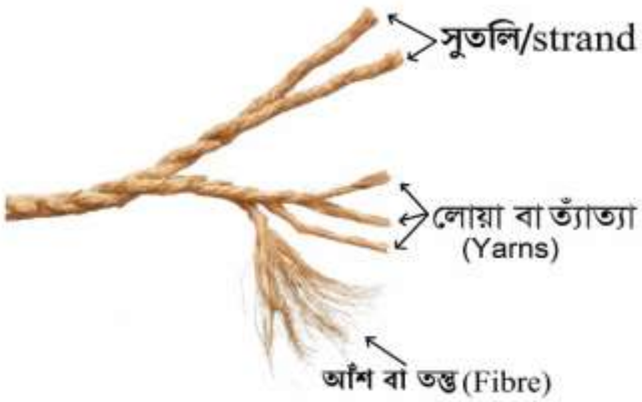

চিত্র ১: তিন সুতলি বিশিষ্ট দড়ি (প্রতিটি সুতলি চারটি *লোয়া* সমন্বয়ে তৈরি)

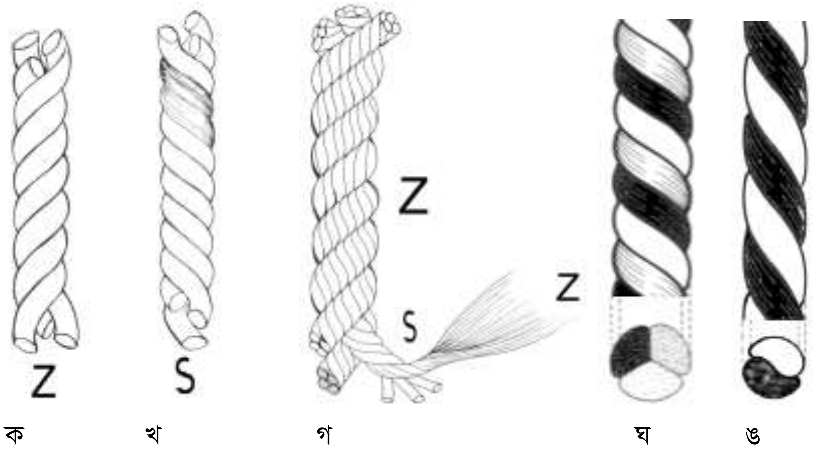

চিত্র ২: ক. ডান থেকে বাঁ দিকে প্যাঁচ বিশিষ্ট দড়ি; খ. বাঁ থেকে ডান দিকে প্যাঁচ বিশিষ্ট দড়ি; গ. চার *লোয়া* ও তিন সুতলির দড়ি, যা ক্রমান্বয়ে Z, S ও Z প্যাটার্নের প্যাঁচ বিশিষ্ট; ঘ. তিন *লোয়া* বিশিষ্ট দড়ির প্রস্থচ্ছেদ; ঙ. দুই *লোয়া* বিশিষ্ট দড়ির প্রস্থচ্ছেদ (ড্রইং: লেখক)

দড়ির ব্যবহার, স্থানীয় ও ব্যবহারিক নাম এবং উপকরণ

ব্যবহার

চালার কাঠামো ও ছাউনি বাঁধাই; বাঁশ, কঞ্চি, পাটকাঠি বা অন্য কোনো উপকরণের আবেষ্টনী বা বেড়া বাঁধাই; শিকা ও ভ্যাড়া তৈরি, জোয়ালের সাথে লাঙল ও মই সংযোগ, পশুবাহিত গাড়ির *ধুর* বা ঝুড়ির সাথে মূল কাঠামোর সংযোগ (মর্মা টানা), বাদ্যযন্ত্র গলায় ঝোলাতে; মূল কাঠামের সাথে

জোয়াল সংযোগ; ভেলা তৈরি; নৌকার গুণ, পাল, নোঙর; পশু নিয়ন্ত্রণ; মৎস্য সংগ্রহের নানান পদ্ধতি; সেচ; কূপ থেকে পানি উত্তোলন, খেজুর গাছে রস কাটা; গাছ ফাড়া; তৈজসপত্র বাঁধাই, তাঁত, মোড়া বা খাটিয়া তৈরি প্রভৃতি কাজে দড়ি ব্যবহৃত হয়।

নাম[১১]

দড়ি, রজ্জু বা রশির অনেক সমার্থক শব্দ রয়েছে, সেসব শব্দ আঞ্চলিক বা ব্যবহারভিত্তিক। যেমন, সুতলি বা সুতালি হলো সরু দড়ি। সরু দড়ি ডুরি নামেও পরিচিত। তবে কুমিল্লা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে একসময় ডুরি শব্দ দিয়ে লম্বা সুতা বোঝানো হতো। বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁয় ঘরের চালা বা বেড়া বাঁধাইয়ের জন্য বিশেষ সরু দড়ি শুধু *সুতলি* নামে পরিচিত। *তবে তাইতা, তাইত্যা, তাইত্‌তা শব্দসমূহও দড়ির সমার্থক। তাইতা ও তাইত্‌তা ময়মনসিংহে ও তাইত্যা* রাজশাহীতে প্রচলিত শব্দ। তেমনি খুলনায় *তাগা* করা অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বাঁধা আবার *ধাগা* খুলনা ও রাজশাহীতে মোটা সুতা হিসেবে পরিচিত। পাটের তৈরি লম্বা দড়ি ঢাকা ও ফরিদপুরে *দরা* নামে অভিহিত হয়। আবার পাবনায় মইয়ের সাথে জোয়াল সংযোগের দড়ির নাম *দরা*। মোটা দড়ি প্রায় সময় *দড়া* বা কাছি নামে পরিচিত। তবে কাছি মূলত নৌকা বা জাহাজ বাঁধার কাজে ব্যবহৃত মোটা দড়ি। আবার *কাছি* পুরুলিয়া-বীরভূমে খেওলা জালের নিচের অংশ *ঘাই* বাঁধার সময় লোহার কাঠির ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করানো শক্ত ধরনের সুতা বা দড়ি। পুরুলিয়াতে এর নাম কাঁচি। আবার কাচি মালদহ ও হাওড়াতে শিউলী অর্থাৎ যারা খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করেন তাদের কোমরে বাঁধা মোটা দড়ি। দার্জিলিং-এ প্রচলিত নিকটবর্তী শব্দ *কাছ্*-এর অর্থ হাতির গলায় বাঁধার দড়ি, যা মাহুত ধরে রাখে। দুধ দোহনের সময়ে গাভি যাতে পা ছুঁড়তে না পারে তার জন্য যে দড়ি দিয়ে গাভির পা বাঁধা হয়, তার নাম ছাঁদনদড়ি। চব্বিশ পরগনায় পাটের দড়ি *কচ্‌ড়া* নামে পরিচিত। রংপুরে মোটা দড়ি বা দুই পাকের দড়ি দোতা নামে পরিচিত। পুরাণে রথ টানা দড়ির নাম শঙ্খচূড়, স্বর্ণচূড় ও বাসুকি।

গরু-ছাগলের গলায় বাঁধা দড়ি গালাসী এবং মাঠে ঘাস খাওয়ানোর জন্য খুঁটার সাথে গালাসীতে সংযুক্ত দীর্ঘ দড়ি পাগা (মহাদেবপুর, নওগাঁ), ড্যাড়া (ধামইরহাট, নওগাঁ), নামে পরিচিত। গরু-মহিষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সরু দড়ি নাক ছিদ্র করে গালাসীর সাথে বাঁধা হয়, তা নাকল ও নাকের উর্ধ্বদেশে বৃত্তাকার ফাঁস মুগারী নামে পরিচিত। এছাড়া গরু-মহিষের গলার সাথে জোঁয়ালের বন্ধনের জন্য ব্যবহৃত দড়ি জোঁত্ বা জোতন্, কিন্তু লাঙলের ঈষের সাথে জোয়ালের সংযুক্তিকরণে ব্যবহৃত বিশেষ দড়ির নাম নেংরা। নাকল, মুগারী, জোঁৎ নেংরার তুলনায় সরু। এদের চেয়ে যে মোটা দড়ি পশুবাহিত গাড়ির ধুর ও ফর এবং ফর ও জোয়ালকে সংযুক্ত করে তার নাম মর্মা দড়ি। ফসল মাড়াইয়ে একাধিক পশুকে সংযুক্তকরণের জন্য গলায় বাঁধা দড়ি মলন দড়ি নামে পরিচিত। পাবনা, বাখেরগঞ্জ (বরিশাল) ও বগুড়ায় এই দড়ির নাম ডোগা। রশিটি দাউইন্যা[১২], দাউন, দাওন, দাওনদড়ি, মলনদড়ি[১৩] নামেও পরিচিত। চব্বিশ পরগনা ও হাওড়া অঞ্চলে নৌকার পালের দড়ি গোচ্ নামে পরিচিত। এই শব্দের দ্বারা মেদিনীপুরে খড়ের দড়িকে বোঝানো হয়ে থাকে।

উপকরণ : পৃথিবীব্যপী স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন নানান আঁশ (ফসল) ও ঘাস থেকে দড়ি তৈরি করা হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় আবাকা (Abaca) বা ম্যানিলা হেম্প, সিসাল (Sisal), হেনেকেন

(Henequen), পাট, শণ (Hemp), শণপাট (Crotalaria juncea), গাঁজা (Hemp/Marijuana), তিসি (Flax) ও কার্পাস তন্তু। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি তন্তু পাওয়া যায় পাতা থেকে, কার্পাস পাওয়া যায় ফল (বীজের পাশ) থেকে এবং বাকি তন্তুসমূহ পাওয়া যায় কাণ্ডের ছাল থেকে।[১৪] বাংলা অঞ্চলে দড়ির উপকরণ হিসেবে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় পাট, শণপাট, ছন (ঘাস), বাবুই বা সাবাই ঘাস, পাতিঘাস[১৫], নারিকেল ছোবড়া, উদাল প্রভৃতি। *বাংলাপিডিয়া*'র মতে আনারস পাতা ও কলাগাছের কাণ্ড থেকেও আঁশ পাওয়া যায়। এছাড়া তাল পত্রবৃন্তের (Petiole) আঁশ, তাল-খেজুরের শেকড়, গাঁজার তন্তু ও অন্যান্য আঁশ থেকেও তন্তু তৈরি করা হয়। তবে বাংলা অঞ্চলে সব উপকরণ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়নি, বরং স্থানীয়ভাবে সুলভ উপকরণেই স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হতো। এসব উপকরণের মধ্যে গাঁজা ও শণ (হেম্প) একই পরিবারভুক্ত হলেও জাত পৃথক (দ্র. সারণি ১)। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয়রা বন-জঙ্গলে আঁশ বা তন্তু পাওয়া যায়, এমন উদ্ভিদের অভাব অনুভব করেনি কখনো।[১৬] ভারত উপমহাদেশের বন-জঙ্গলে প্রায় ৯০টি উদ্ভিদ চিহ্নিত হয়েছে, যা থেকে তন্তু পাওয়া যায়।[১৭] তন্মধ্যে উদাল আঁশ থেকে মোটা দড়ি তৈরি করা হয়।[১৮]

সারণি ১: দড়ি সংশ্লিষ্ট তন্তুর প্রধান উৎসসমূহের পরিচিতি

নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিবার	প্রজাতি (Species)	জাত (Variety)	আঁশের উৎস
আবাকা (Abaca-Manila Hemp)	Musa textilis	Musaceae	Musa textilis	-	পাতা
সিসাল (Sisal)	Agave sisalana	Asparagaceae	Agave sisalana	-	পাতা
হেনেকেন (Henequen)	Agave fourcroydes	Asparagaceae	Agave fourcroydes	-	পাতা
পাট (Jute)	Corchorus spp.	Malvaceae	Corchorus capsularis (সাদা পাট), Corchorus olitorius (তোষা পাট)	-	কাণ্ডের বাকল
শণ (Hemp)	Cannabis sativa	Cannabaceae	Cannabis	Industrial hemp	কাণ্ডের বাকল
গাঁজা (Hemp)	Cannabis sativa	Cannabaceae	Cannabis sativa	Marijuana	কাণ্ডের বাকল
শণপাট (Sunn Hemp)	Crotalaria juncea	Fabaceae	Crotalaria	-	কাণ্ডের বাকল
তিসি (Flax)	Linum	Linaceae	Linum usitatissimum	-	কাণ্ডের বাকল
ছন (Sungrass/Cogon grass)	Imperata cylindrica	Poaceae	Imperata	Imperata cylindrica	সম্পূর্ণ তৃণ
বাবুই বা সাবাই ঘাস (Baib/Babui grass)	Eulaliopsis binata	Poaceae	Eulaliopsis		সম্পূর্ণ তৃণ
উদাল	Sterculia villosa	Malvaceae	Sterculia		কাণ্ডের বাকল

সূত্রঃ Plants of the World Online, https://powo.science.kew.org, 25.11.2025

সনাতন হাতিয়ার ও প্রযুক্তি

বাংলা অঞ্চলে দড়ি তৈরিতে ঐতিহ্যবাহী ও অধিক জনপ্রিয় যন্ত্র বা হাতিয়ার হলো বেলনি, টাকুর ও ঢ্যাঁড়া। এসব যন্ত্র বেলনা, উটকোন, উটকুন, বল্লা, টাকুরাশি, পাট টাকুর, ঢ্যারা, টারকিশ, টাহুর, টাকুরী প্রভৃতি নামে নানান অঞ্চলে পরিচিত। তবে তিনটিই সারা বাংলায় সার্বজনীন ও আদি। এসব যন্ত্রকে স্বল্প শক্তি প্রয়োগ করে ঘূর্ণায়মান রাখা যায় এবং এসবের আবর্তনে পেশিশক্তি ব্যতীত অন্যকোনো শক্তির প্রয়োজন পড়ে না। তিনটি যন্ত্রই ঘূর্ণন যন্ত্র হলেও এদের আকার ও ব্যবহার পৃথক। প্রকৃতপক্ষে এসব হাতিয়ার সরাসরি দড়ি তৈরি করে না, বরং দড়ির ত্যাঁত্যা বা লোয়া তৈরি করে। কার্যত দুই বা ততোধিক ত্যাঁত্যা বা লোয়া একত্র করে এদের প্যাঁচের বিপরীত দিকে পাক দিলে দড়ি তৈরি হয়।

ক. বেলনী: সম্পূর্ণরূপে বাঁশ থেকে তৈরি ও সরল একটি যন্ত্র বেলনি (চিত্র ৩)। এটি তৈরি করতে বাঁশের দুটি কাঠি বা দণ্ড, একটি ফাঁপা নল ও এক টুকরা সরু দড়ি প্রয়োজন হয়। এটি দেখতে অনেকটা ক্রুশাকৃতির ও হাতলটি হাত পাখার ডাঁটি বা হাতলের ন্যায়। দুটি কাঠির একটি তুলনামূলক লম্বা (২০/২২ ইঞ্চি), এর এক প্রান্তে স্বল্প মোটা করে গিঁট রাখতে হয়। এরপর এই কাঠির মধ্যে নল প্রবেশ করানো হয়, যা পূর্বোক্ত গিঁটের কারণে কাঠি থেকে বের হয়ে যেতে পারে না। এই লম্বা কাঠির অপর দিকে আড়াআড়ি করে অন্য কাঠিটি সরু দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। এরপর আড়াআড়ি কাঠির এক প্রান্তে তন্তুরগুচ্ছকে বেঁধে বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙুলের নিয়ন্ত্রণে ক্রমান্বয়ে তন্তু গুচ্ছকে ছাড়তে হয় একই সাথে অপর হাতে হাতল ধরে হাতপাখার মতো বেলনির মাথাকে বাঁ থেকে ডানে ঘুরাতে হয় (চিত্র ৪)। ফলে তৈরি হয় এস (S) প্যাটার্নের পাক যুক্ত ত্যাঁত্যা বা লোয়া।

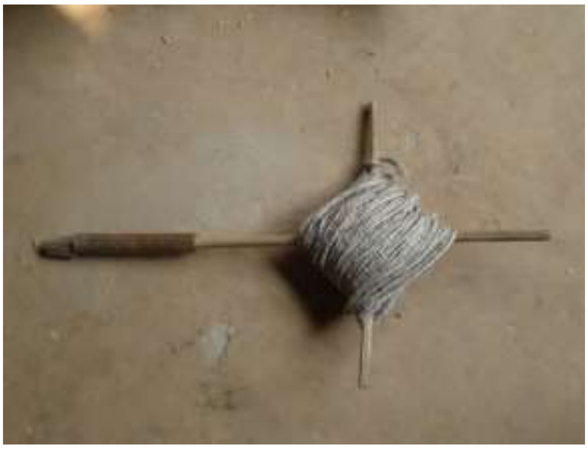

চিত্র ৩: লোয়া পেঁচিয়ে রাখা বেলনি, ২০১২ খ্রি., মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: লেখক)

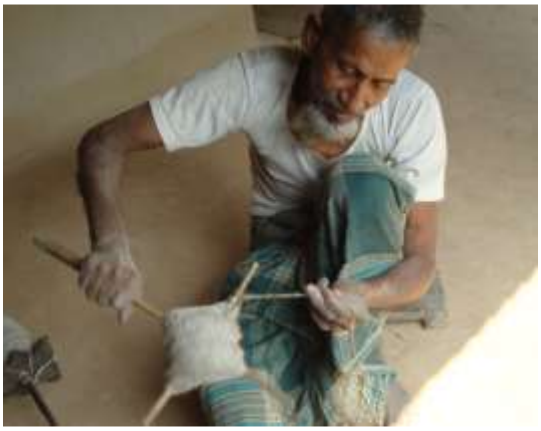

চিত্র ৪: ডান হাতে বেলনি ঘুরিয়ে পাটের লোয়া তৈরি, ২০১২ খ্রি., মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: লেখক)

খ. টাকুর : বেলনির মতো টাকুরও সরল একটি যন্ত্র (চিত্র ৫)। এটি তৈরি করতে বাঁশের একটি কাঠি বা দণ্ড ও এক টুকরো বর্গাকার, আয়তাকার বা ত্রিভুজাকার তক্তা প্রয়োজন হয়, যা বৃত্তাকারও হতে পারে। এই কাঠি বা দণ্ডের দৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট নয়– ৩০/৩৫ ইঞ্চির মতো। শেষোক্ত তক্তার মধ্যভাগে ছিদ্র করে কাঠির এমন স্থানে সংযুক্ত করা হয়, যাতে কাঠির তিন ভাগের দুই ভাগ নিচের দিকে ও এক ভাগ ওপরের দিকে থাকে। ত্যাঁত্যা বা লোয়া তৈরির জন্য তক্তা'র নিচে কাঠিতে এক গুচ্ছ তন্তু সংযুক্ত করে কাঠির উপরিভাগকে পেঁচিয়ে কাঠির চেয়ে দীর্ঘ করতে হয়। এরপর প্রস্তুতকারক বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙুলের নিয়ন্ত্রণে ক্রমান্বয়ে তন্তুগুচ্ছকে ছাড়েন এবং একই সাথে ডান পায়ের উরুতে তন্তু প্যাঁচানো কাঠিকে অপর হাতের তালু দিয়ে ডান থেকে বামে ঘোরাতে থাকেন (চিত্র ৬)। ফলে তন্তুতে জেড (Z) প্যাটার্নের প্যাঁচ তৈরি হয়। পাকানো লোয়া টাকুরের নিম্নাংশে পেচিয়ে রাখা হয়। এই পেঁচানো ও নতুন তন্তুগুচ্ছকে প্রথম তন্তুগুচ্ছের সাথে সংযোগের সময় লোয়া পাকানো বন্ধ থাকে (চিত্র ৭)।

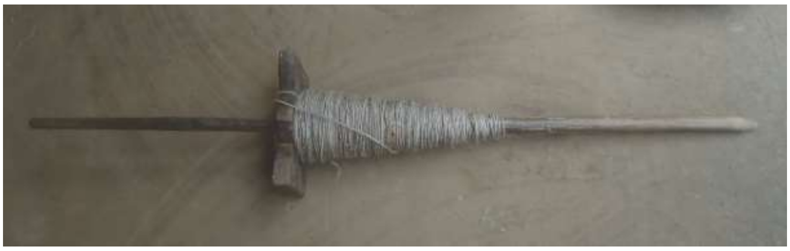

চিত্র ৫: দড়ি তৈরির যন্ত্র টাকুর, ২০১৪ খ্রি., মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: লেখক)

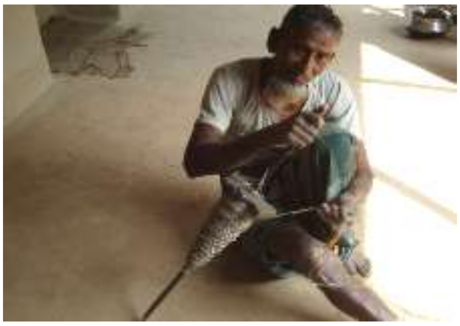

চিত্র ৬: ডান হাত ও উরুতে টাকুর ঘুরিয়ে পাটের লোয়া তৈরি, ২০১২ খ্রি., মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: লেখক)
চিত্র ৭: টাকুর ঘুরিয়ে তৈরিকৃত লোয়া টাকুরের নিম্নাংশে পেঁচিয়ে রাখা, ২০১২ খ্রি., মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: লেখক)

গ. ট্যাঁড়া : দড়ির ত্যাঁত্যা বা লোয়া তৈরির অপর দুটি হাতিয়ারের তুলনায় ঢ্যাঁড়া পৃথক ধরনের (চিত্র ৮)। এটি তৈরিতে প্রয়োজন ৮/১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দুটি কাঠের দণ্ড ও বাঁশের একটি কাঠি বা দণ্ড। কাঠের দণ্ড দুটির মধ্যভাগে খাঁজ কেটে ও ছিদ্র করে একটির ওপরে অন্যটিকে এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যেন, উভয়ই আড়াআড়ি অবস্থায় থাকে। এরপর ছিদ্রের মধ্যে বাঁশের কাঠির এক প্রান্ত প্রবেশ করিয়ে সংযোগ দৃঢ় করার জন্য গোঁজ বা খিল লাগানো হয়। এই কাঠির অপর প্রান্ত একটু বাঁকা বা খাঁজ করা থাকে। এই খাঁজে একগুচ্ছ তন্তু সংযুক্ত করে দড়্যা বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙুলের নিয়ন্ত্রণে ক্রমান্বয়ে তন্তুগুচ্ছকে ছাড়েন এবং একই সাথে ডান হাত দিয়ে ঢ্যাঁড়া'র নিম্নাংশ ঘুরাতে থাকেন। একবার ঘুরিয়ে দিলে যতক্ষণ ঘোরে ততক্ষণ দড়্যা পুনরায় তন্তুর নতুন গুচ্ছ পূর্বোক্ত গুচ্ছের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ পান। এভাবে ক্রমান্বয়ে তন্তু পাকিয়ে ত্যাঁত্যা তৈরি হতে থাকে এবং পাকানো ত্যাঁত্যা ঢ্যাঁড়ার নিচের ক্রসবারে পেঁচিয়ে রাখা হয়। এই হাতিয়ারে পাকানো ত্যাঁত্যার প্যাঁচ জেড (Z) প্যাটার্নের হয়।

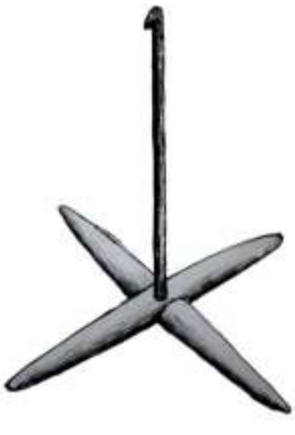

চিত্র ৮: দড়ি তৈরির যন্ত্র ঢ্যাঁড়া, ২০১৪ খ্রি., শাহ্ কৃষি তথ্য কেন্দ্র ও জাদুঘর, নওগাঁ'র সংগৃহীত ঢ্যাঁড়া'র আলোকচিত্র থেকে ড্রইং (ছবি ও ড্রইং: লেখক)

উৎপাদন প্রক্রিয়া

বাংলার দড়ি সম্পূর্ণরূপে বিশেষ তৃণ ও উদ্ভিজ্জ তন্তু থেকে তৈরি। তৃণ মূলত পূর্বোল্লেখিত সাবাই বা বাবুই ঘাস ও ছন। এগুলো কেটে প্রথমে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয়। এরপর ঘাস থেকে অবাঞ্ছিত, মরা, খাটোগুলোকে বেছে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর হালকা ভিজিয়ে বা পানি ছিটিয়ে হাতে পাক তুলে সরাসরি দড়ির লোয়া তৈরি করা হয়। তৈরিকৃত দুটি লোয়া পুনরায় লোয়ার উল্টো দিকে পাক তুললে দড়ি পাওয়া যায়। এই দড়ি আরও মসৃণ করার জন্য একগুচ্ছ দড়িকে একত্র করে গাছের ডালে পেঁচিয়ে টানাটানি করা হয়।

উদ্ভিদের কাণ্ডের বাকল ও পাতা থেকে আঁশ বা তন্তু তৈরি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। শণ, শণপাট, গাঁজা প্রভৃতি পাট জাতীয় উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ পোক্ত হলে গোড়া থেকে কেটে গুচ্ছ আকারে কয়েকদিন ঢেকে রাখতে হয়। এতে সকল পাতা ঝরে যায়। এরপর গুচ্ছকৃত কাণ্ডকে পানিতে ১৫-২০ দিন ভিজিয়ে রাখলে ওপরের পাতলা সবুজ ত্বক পচে যায়, কাণ্ডের অভ্যন্তরের কাঠি ও তন্তুর সম্পৃক্ততা শিথিল হয়ে পড়ে।[১৯] এরপর অঞ্চলভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাঠি হতে তন্তুকে পৃথক করা হয়। পৃথককৃত তন্তুকে রৌদ্রে শুকালেই দড়ি তৈরির উপযোগী হয়।

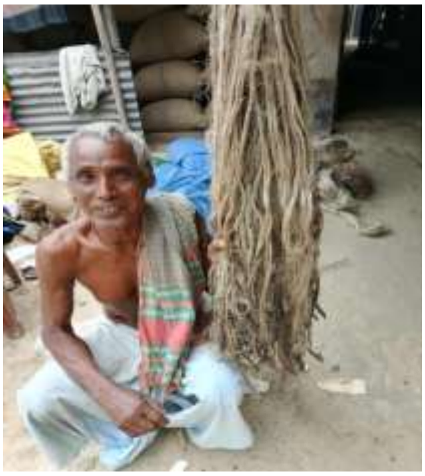

চিত্র ৯: ঝুলানো পাটের তন্তু, ২০২৫ খ্রি. ধামইরহাট, নওগাঁ (ছবি: জাহাঙ্গীর আলম)

পাতা থেকে আঁশ বা তন্তু পাওয়ার জন্য সাধারণত চিরুনির মতো বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়। বাংলাদেশে এখন আনারসের পাতা ও কলাগাছের কাণ্ড[২০] থেকে এই যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চমানের তন্তু সংগৃহীত হচ্ছে। উৎপাদিত তন্তু বা আঁশকে দড়ি তৈরির কাজে ব্যবহারের পূর্বে যন্ত্রোপযোগী করে নিতে হয়। আলোচ্য তিনটি যন্ত্রের সাহায্যে দড়ির লোয়া তৈরির জন্য প্রথমে কয়েক গুচ্ছ তন্তুকে বিশেষত পাটের তন্তুর মাথার (সরু) দিক উঁচু এমন স্থানে বাঁধতে হয় যেন, তন্তুর নিম্নভাগ প্রস্তুতকারকের হাতের নাগালে থাকে (চিত্র ৯)। এরূপ ঝোলানোকে অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী

নারীর চুলের সাথে তুলনা করেছেন।[২১] এ সময় তন্তু কার্যত কাণ্ডের খোলস হিসেবে স্বতন্ত্র থাকে– সেগুলোকে যতটা সম্ভব চিরে চিরে ক্ষীণ করা হয়। তন্তুকে যত বিচ্ছিন্ন করা হয়, লোয়া ততই মসৃণ হয় এবং পাকের সময় তন্তুসমূহ অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। ফলে দড়ি আরও দৃঢ় হয়। এরপর ঝুলানো তন্তু থেকে প্রস্তুতকারক ডান হাতে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বাঁ হাতের বৃদ্ধা ও তর্জুনী আঙুলের সাহায্যে দড়ির লোয়া তৈরি করে থাকেন এবং লোয়া হাতিয়ারেই পেঁচিয়ে রাখেন। লোয়া কত সরু হবে তা প্রস্তুতকারক নির্ধারণ করেন, এরজন্য গাণিতিক কোনো মাপের প্রয়োজন হয় না; তাঁর হাতের দক্ষতায় প্রতিবার প্রায় একই পরিমাণ তন্তু ছিড়ে সংযুক্ত করেন এবং বাঁ হাতের দুই আঙুল তা নিয়ন্ত্রণ করে যে লোয়া একই পরিধির ও পাকের হচ্ছে কি না।

এ প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসুকে উদ্ধৃত করা যায়, তিনি লিখছেন– স্টিমার বাঁধার *কাছি* 'আলাদি' চট্টগ্রামের পাঠানটুলি, মোগলটুলি, মাদারবাড়ি, আগরাবাতে পাওয়া যায়। সমুদ্র ও কর্ণফুলীর নিকটবর্তী বলে আবহাওয়াজনিত কারণে সেখানে ভালো দড়ি তৈরি সম্ভব হয়, অন্যত্র এত ভালো দড়ি হয় না। এই অঞ্চলে শণ, উদাল গাছের ছাল দিয়েও দড়ি তৈরি করে। এই দড়ি জলে নষ্ট হয় না। নানাবিধ তেলের মধ্যে চোবানো হয় বলে 'আলাদি' জলরোধী হয়। কাতার 'আলাদি', ইস্তকের আলাদি, দোতন, ধাতন, লইত (সরু), সুতি, সুতলি, টপলাইন (জালের ওপরের শক্ত সুতা), টঁওর নামে এই দড়ি পাওয়া যায়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের হাবড়া শহরের নিকটে কয়েকটি গ্রামের লোকেরা দড়ি বিক্রয় করে জীবিকা উপার্জন করত।[২২]

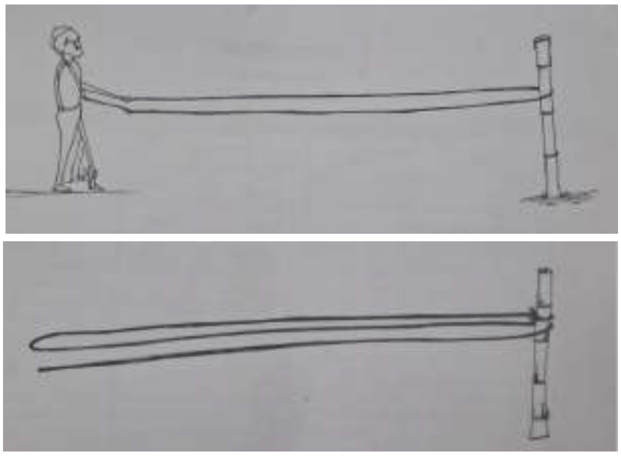

চিত্র ১০: দুই খ্যেও ও তিন খ্যেও দিয়ে দুই ও তিন লোয়ার দড়ি তৈরির পূর্ব ধাপ (ড্রইং: লেখক)

এরপর লোয়া থেকে দড়ি তৈরির জন্য পদক্ষেপ নিতে হয়। দড়িকে যত দীর্ঘ করার প্রয়োজন হয়, ঠিক তত দূরের কোনো বাঁশ, খুঁটি বা গাছের ডাল থেকে একটি লোয়াকে ঘুরিয়ে আনার প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়ে নির্ধারিত হয় যে, দড়ি কত লোয়া বিশিষ্ট হবে। লোয়ার ন্যূনতম দুই খ্যেও দিয়ে দুই লোয়ার, তিন খ্যেও দিলে তিন লোয়ার দড়ি পাওয়া যায় (চিত্র ১০)। এরপর একাধিক লোয়া

একত্র করে লোয়া যে দিকে পাক দেওয়া তার বিপরীত দিকে পাক দেওয়া হয় । সাধারণত হাতে হাতে, অনেক সময় দুই প্রান্তরে দুটি কাঠি সংযুক্ত করে দুই জন হাতে হাতে পাক দিয়ে তৈরি করেন।

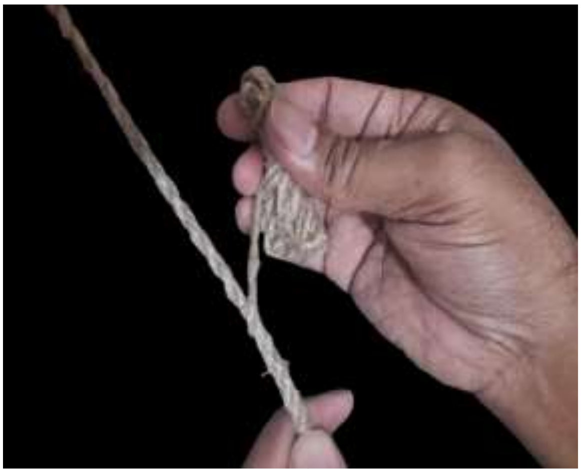

চিত্র ১১: দুই লোয়ার দড়িতে পৃথকভাবে তৃতীয় লোয়া পেঁচানোর কৌশল, ২০২৫ খ্রি., মিরপুর, ঢাকা (ছবি: মম পূর্ণতা)

গৃহস্থালি কিছু কাজে যেমন, পশুবাহিত গাড়ি তৈরি, পরিবহণ, জাল দিয়ে মাছ আহরণ, পশু নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত টেকসই ও মোটা দড়ি তৈরি করার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। একজন দুটি লোয়া একত্র করে একপ্রান্ত পায়ের পাতায় চেপে ধরে দুই হাতের তালুর সাহয্যে পুনরায় পাক তোলেন এবং অপর প্রান্তে অন্য একজন দুটি লোয়া দুই হাতে নিয়ে হাত বদল করে থাকেন। এভাবে তৈরিকৃত দড়ির লোয়া বেশি পাক পায় বলে দড়ি বেশি মজবুত হয়। সম্পূর্ণ দড়ি পাকানো হয়ে গেলে একে আরও শক্তিশালী করার জন্য আর একটি লোয়া পেঁচানো হয়। এই কাজটি একজন ব্যক্তিই সম্পন্ন করতে পারেন। এজন্য পূর্বোক্ত দড়িটির এক প্রান্ত কোনো কিছুতে বেঁধে প্রস্তুতকারক অন্য প্রান্তে অন্য একটি লোয়াকে পূর্বোক্ত দড়ির প্যাঁচে প্যাঁচে পেঁচিয়ে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হন। এক্ষেত্রে নতুন অর্থাৎ তৃতীয় লোয়াটিকে একটি কোনো কিছুতে পেঁচিয়ে নিয়ে বল বা মাকুর মতো তৈরি করে নিতে হয়। মোটা দড়ি সাধারণত এই প্রক্রিয়াতেই তৈরি করা হয় (চিত্র ১১)।

বাংলার প্রেক্ষাপট : বাংলার আবহাওয়া ও উপকরণের কারণে দড়ি নিজে প্রত্ন-নিদর্শন হিসেবে টিকেনি। তবে বানগড়ের পাতকুয়ার রিং-এ দড়ির ছাপ চিহ্নিত হয়েছে।[২৩] নালন্দার দেয়াল অলংকণে যেসব মোটিফ লক্ষ করা গেছে, তার মধ্যে দড়ির নকশাও রয়েছে।[২৪] এছাড়া অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক উদাহরণও উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন, চব্বিশ পরগনা জেলা থেকে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের একটি সূর্য-ভাস্কর্যে দড়ির ব্যবহার সুস্পষ্ট– মূর্তিতে দেখা যাচ্ছে সূর্যদেবকে নিয়ে

সারথি অরুণ সাতটি ঘোড়ার গলায় আবদ্ধ দড়ির অপর প্রান্ত-গুচ্ছ ধরে যান পরিচালনা করছে (চিত্র ১২)।[২৫]

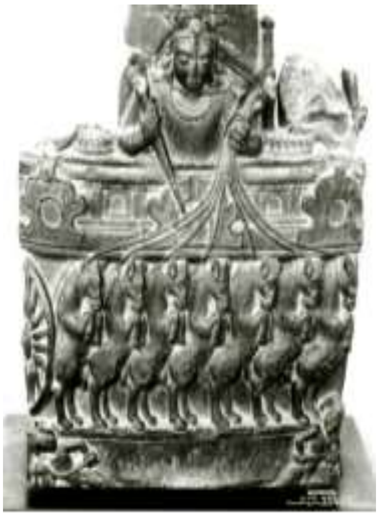

চিত্র ১২: সারথি অরুণের হাতে সাত ঘোড়ার দড়ি
(ছবিঃ Frederick M. Asher, *The Art of Eastern India, 300-800*, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1980, p. 61 (Plate 105)

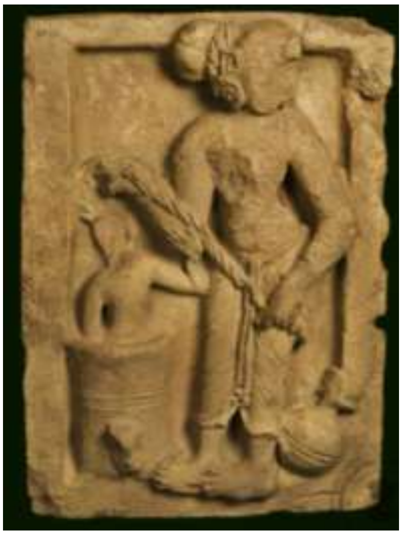

চিত্র ১৩: দড়ি দিয়ে বেঁধে শিশুকে কূপে নামাচ্ছেন বা তুলছেন এক নারী
(ছবিঃ Accession Number 9772/A20084, Museums of India, https://museumsofindia.gov.in)

বাংলাদেশসহ সারা বাংলায় সূর্য-ভাস্কর্য বহু পাওয়া গেছে।[২৬] বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সূর্য-ভাস্কর্যেও রশির উপস্থিতি সুস্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে মথুরা জাদুঘরে সংরক্ষিত সপ্তম থেকে দশম শতকের দুটি মূর্তির চিত্র উল্লেখযোগ্য। তাতে পাকানো রশির বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকেও দড়ির ব্যবহার দেখা যায়। একটি ফলকে দৃষ্ট হয় একজন নারী মোটা দড়ি দিয়ে একটি শিশুকে বেঁধে কূপে নামাচ্ছে বা তুলছে (চিত্র ১৩)।[২৭] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অনেক পোড়ামাটির ফলকে হাতিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার চিত্রে (চিত্র ১৪ ও ১৫), হাতি-আকৃতির খেলনায় এবং বসার আসন– মোড়া তৈরির দৃশ্যে দড়ির ব্যবহার দেখা যায়।[২৮] এসব ফলকের কাল খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।[২৯] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত ঘোড়ার গাড়ির দৃশ্য সংবলিত আরও অন্তত দুটি ফলকে দড়ির ব্যবহার স্পষ্ট। এই ফলকের একটি প্রথম অন্যটি দ্বিতীয় শতকের।[৩০]

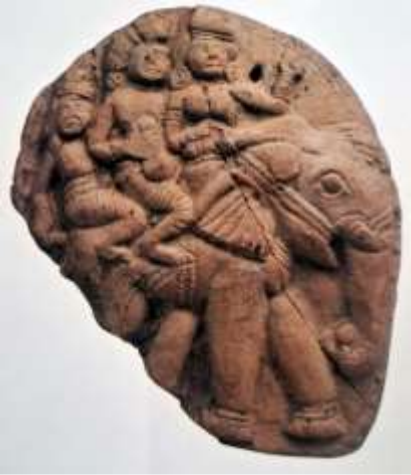

চিত্র ১৪: বাহন হাতির শরীরে দড়ির বাঁধন (ছবি: Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: ICSB, 2001, Plate C 154)

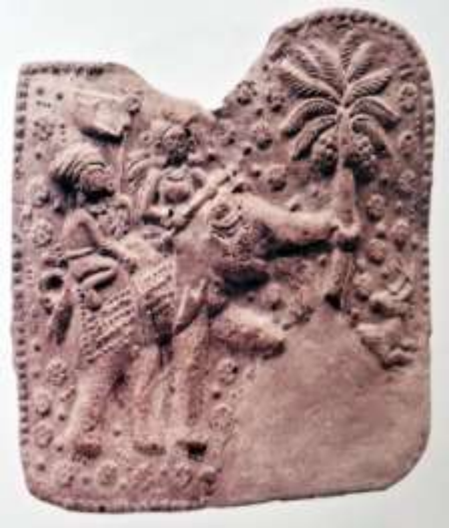

চিত্র ১৫: বাহন হাতির শরীরে দড়ির বাঁধন (ছবি: Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: ICSB, 2001, Plate C 683)

বাংলার জন-জীবনের সাথে দড়ি এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, বাংলা সাহিত্যেও এর ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মধ্য ও প্রাচীনযুগের প্রায় সকল সাহিত্য নিদর্শনে দড়ি নানারূপে উল্লেখিত হয়েছে। আঠারো শতকের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী'র *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের 'হস্তি-বধ পালা'য় হাতি বাঁধার কাজে

ব্যবহৃত দড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, আগাড়ি পিছাড়ি দড়ি ছড়াইয়া যায়/ গা খানি মাজিয়া নিল রাজার সভায়।।[৩১]। গরু বিশেষত গাভীর দুধ দোহনের সময় পা বাঁধার দড়ির খবর পাওয়া যায় কেতকাদাস রচিত সতেরো শতকে রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যে। সেই দড়ির নাম ছাঁদন দড়ি।[৩২] একইভাবে ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনু. ১৫৪০-১৬০০) *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে উল্লেখিত হয়েছে, 'নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা/ দড়ায় শুখায় নানা বাসে/ দরজি কাপড় শিঞে [সেলাই করে] বেতন করিআ জিঞে/ গুজরাটে বৈসে এক পাশে।'[৩৩] একই কাব্যে দড়া মাপের মাধ্যম হিসেবেও উল্লেখিত হয়েছে।[৩৪] এছাড়া মানুষ বাঁধা দড়া[৩৫], নৌকার দড়া[৩৬], জালে বাঁধা দড়ি[৩৭], খাটের দড়ি[৩৮], চুল বাঁধা দড়ি[৩৯], বিশ্বকর্মার দড়ি[৪০], শণ-দড়ি[৪১], বাবুই (ববাই) ঘাস[৪২] (চিত্র ১৬) প্রভৃতিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার কাব্যে উল্লেখ করেছেন।

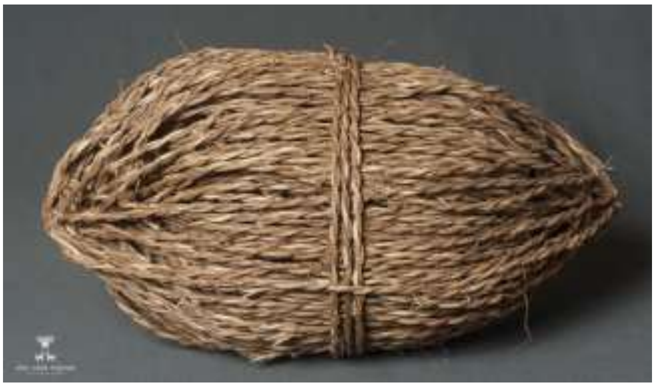

চিত্র ১৬: বাবুই বা সাবাই ঘাসের দড়ি (ছবি: Kala Bhoomi Odisha Crafts Museum, Bhubaneswar, Odisha. Museum No: Tribal Display 161, Accession No.: KB03642, 01-10-2019, https://vmis.in)

পনেরো শতকে মালাধর বসু রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*-এ সিকা'র প্রসঙ্গ আছে। বলা হয়েছে, সিকায় কারিয়া অর্ন্ন লৈহ সব ছাওালে/ বাছুর রাখিয়া অর্ন্ন খাব জমুনার কুলে।[৪৩] সমসাময়িক রচনা *মনসামঙ্গল*-এ উলুর মোটা দড়ি অর্থে 'উলুর কচড়া' ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৪] একই সময়ে রচিত কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ*-এ রথের দড়া উল্লেখিত হয়েছে।[৪৫] আরো দৃষ্ট হয় সেই দড়ি দিয়ে পতাকা বাঁধার দৃশ্য[৪৬], আবার লেজে অগ্নি গলায় 'দড়া দিয়া রাক্ষসে করে টানাটানি'র দৃশ্যও।[৪৭] *রামায়ণ*-এ হাতি ধরার জন্যও যে দড়ি ব্যবহৃত হতো তা উল্লিখিত হয়েছে।[৪৮] *চণ্ডীদাসের পদাবলী*'তে উল্লেখিত হয়েছে, 'বন্ধুর পিরিতি কুহকের রীতি/ সকলি মিছাই রঙ্গ।/ দড়াদড়ি লঞা গ্রামেতে চড়িয়া/ ফিরয়ে করিঞা সঙ্গ।।[৪৯]। আরো পূর্বের রচনা *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ দড়ি 'দৌড়ী' ও 'দড়ী' রূপে উল্লেখিত হয়েছে।[৫০] পাশাপাশি একই রচনায় দড়ি তৈরির মনোহর একটি দৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন–

> নালিচা কাটিআঁ কাহ্নিঞিঁ মাঝ জলে থুইল।
> বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল।।

সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর।।
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুয়া।।
বঁহুক যোড়িআঁ গেল যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে।।[৫১]

তারও আগে রচিত[৫২] *শূন্যপুরাণ* কাব্য গ্রন্থে দড়ি নানা প্রসঙ্গে নানা রূপে পাওয়া যায়। *শূন্যপুরাণ*-এর অথ বৈতরণী পর্বে কছি সম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (সাত পাঞ্চ তাহে ধর্ম্ম নাএ দিল কাছি।/ধীরে ধীরে টানে নৌকা ডাআরি ডাঁর রাখি।।)।[৫৩] শুধু তাই নয় পাটের গাঁইট (রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা পর্ব) এবং পাটের দড়ি অর্থে ‘পাটের ডুরি’ (অর্থ ঘোড়া সাজানঃ ৭), ‘পাটের ডোর’ (অথ ধর্ম্ম-সাজান : ১৪), ‘দুগাছি সলি দড়ি’ (অর্থ চাস : ১৮) শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত *চর্যাপদ*-এও দড়ি উল্লিখিত হয়েছে। মোটা দড়ি হিসেবে ‘কাচ্ছি’ ও ‘কাচ্ছী’ শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে *চর্যাপদ*-এর ৮ ও ১৪ সংখ্যক চর্যায়।[৫৪]

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ভারত উপমহাদেশে তথা বাংলা অঞ্চলেও জনজীবনের নানান কাজে দড়ির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং দড়ির প্রাচীনত্ব বাংলা অঞ্চলে সর্বাতীত খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। জ্ঞাত তথ্যমতে, দড়ি বিষয়ে এর চেয়ে প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে দড়ি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির আরো অতীতের ইতিহাস অন্বেষণ করা অসম্ভব নয়। সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত ভৌত-প্রত্ন নিদর্শন ও সমকালীন সাহিত্য (কাব্য, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনি, চিঠি, নথিপত্র প্রভৃতি) সহ ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় ‘অন্য উৎস’ ব্যবহার করে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচনের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।[৫৫] সেই ভিন্ন উৎসের অন্যতম হলো প্রত্ন-শব্দ (Archaeo-word)।[৫৬] বাংলা ভাষার প্রত্ন-শব্দ বা শব্দের ব্যুৎপত্তি (Etymology) চর্চার তথ্য ব্যবহার করে বাংলার সনাতন প্রযুক্তির ইতিহাস পুনর্গঠন করা কঠিন। এ বিষয়ে দড়ি, দড়ি উৎপাদন ও তৎ-সংশ্লিষ্ট বাংলা শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক (etymologycal) তথ্য ও তাদের সামাজিক ব্যাখ্যা বিশেষ সাহায্য করতে পারে।

শব্দের প্রত্নতত্ত্ব[৫৭]

বাংলা অভিধান মতে সংস্কৃত দোর থেকে দড়া এবং দড়া থেকে দড়ি শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু শব্দের বুৎপত্তি বিষয়ক অভিধান বা কোষ গ্রন্থে উভয় শব্দকেই দ্রাবিড় উৎসজাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দড়ি তৈরির হাতিয়ার, যা উটকোন বা উটকুন নামে পরিচিত সেই শব্দও সম্ভবত দ্রাবিড় শব্দ ‘উটার’-এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা দ্রাবিড় ‘উটার’ শব্দের অর্থ বস্তার মুখ বাঁধা দড়ি। আবার বস্তার সমার্থক ছালা শব্দটি বস্তা ও ঝোলা অর্থে দ্রাবিড়। তবে গাছের ছাল থেকে তৈরি হয় অর্থে ছালা শব্দটি সাঁওতালি উৎসজাত। বাংলায় খড়ের দড়ি বহুল প্রচলিত। সেই খড় শব্দটিও দ্রাবিড়, আবার খড়ের দড়ির আরেক নাম ‘নেআলি’ ও ‘নেয়ালি’ উভয়ই দ্রাবিড়। আবার খড় পাকিয়ে তৈরি মোটা দড়ি বড়ু বা বোড়, যা মূলত মরাই তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, তা অস্ট্রিক ভাষাজাত। এই

দড়ি দেখতে অনেকটা সাপের মতো। তাই *চর্যাপদ*-এ (৪১) উল্লেখিত হয়েছে– 'রাজসাপ দেখি জো চামকিই ষারে কিং তং (কং) বোড়ো খাই।।'[৫৮] অধিকাংশ গবেষক 'রাজসাপ' ও 'বোড়ো' শব্দের অর্থ করেছেন রজ্জুসর্প ও বোড়ো সাপ হিসেবে। তবে সুকুমার সেন 'বোড়ো'কে চিহ্নিত করেছেন খড়ের মোটা দড়ি হিসেবে।[৫৯] তবে *বড়্* শব্দটি মোটা পাকানো দড়ি অর্থে দ্রাবিড়। দড়ি তৈরির হাতিয়ার টাকুর, যা টাকুরাশি, টারকিশ, টাকুরি, টাহুর প্রভৃতি নামে পরিচিত সেই 'টাকুর'-এর সাথে সাঁওতালি 'টাকু' শব্দের গভীর সম্পর্ক থাকতে পারে। কেননা সাঁওতালি 'টাকু' শব্দের অর্থ তুলা থেকে সুতা কাটার ও সেই সাথে সুতা রক্ষিত রাখার যন্ত্র, উল্লিখিত টাকুর-এর সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ। আরেকটি সাঁওতালি শব্দ 'টাকোএ' শব্দের অর্থ টাকুর সাহায্যে সুতা কাটা। আবার দ্রাবিড় শব্দ টাকু'র অর্থ তাঁতের যন্ত্রবিশেষ ও 'তকলি'র অর্থ সুতা পাকানোর যন্ত্র। নওগাঁ জেলায় গবাদি পশু বাঁধার দড়ি *পাগা* সমার্থে শব্দটি দ্রাবিড় থেকে আগত। দড়ি তৈরির উপকরণ পাট শব্দটিও দ্রাবিড় উৎসজাত। এছাড়া *মুগারি* নামে পরিচিত পশুর নাক-মুখ বাঁধা দড়ি পশুর নাক-বাঁধা দড়ি অর্থে দ্রাবিড় 'মুখড়্' সম্ভবত একই উৎসজাত। পাট বা তদ্রুপ গাছের কাণ্ড থেকে তন্তু সংগ্রহ পদ্ধতি 'জাগ' দেওয়া শব্দটি দেশি।

মুণ্ডারি ভাষাতেও দড়ি সংশ্লিষ্ট অনেক শব্দ রয়েছে। দড়ি অর্থে 'Bāyār', সরু দড়ি অর্থে 'B○ṛ', দড়ির তন্তু 'Chop', দড়িতে কিছু পেঁচানো অর্থে 'Ḍērā', এক গুচ্ছ দড়ি অর্থে 'Ḍhulā', পশুর কাঁধে জোয়াল বাঁধার দড়ি অর্থে 'Joti', রসি 'Rasi' অন্যতম।[৬০] আবার দড়ি নেপালি ভাষায় 'দোড়ি', রাজবংশীতে 'রোসি', সাদ্‌রিতে 'পাঘা', বোড়োতে 'ডুডুং'/'ডুরুং', রাভায় 'কুড়', টোটোতে 'পেরদি', ধিমল-এ 'ডিহা', সাঁওতালিতে 'বারের' নামে পরিচিত।[৬১]

সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের উপর্যুক্ত ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শব্দসমূহের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, জ্ঞাত তথ্যমতে বাংলা অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রধান।[৬২] আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের[৬৩] দিকে উত্তর ভারতে আগমনের অনেক পরে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্তযুগের পূর্বে[৬৪] বাংলা অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রাই ছিলেন প্রধান জনগোষ্ঠী।[৬৫] এদের ভাষা যথাক্রমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা নামে পরিচিত। অস্ট্রিক ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে মুণ্ডারি ভাষা– যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, কোরবু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে থাকে।[৬৬] অপর দিকে দ্রাবিড় ভাষার উত্তরসূরি হলো গোণ্ড, মালের, কুই (খন্দ), ওরাওঁ (কুড়ুখ) ভাষা।[৬৭] আর দড়ি ও দড়ি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সনাতন সংস্কৃতির বহু শব্দ আর্যপূর্ব ভাষাগোষ্ঠী হতে আগত, তাই বলা যেতে পারে স্থানীয়ভাবে দড়ি উৎপাদন-প্রযুক্তি ও ব্যবহার সংস্কৃতির সাথে আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সকলেই অবগত যে, বাংলা অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষীদের বিস্তার ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই সূচিত হয়েছে। এসব সম্পর্কের সূত্র ধরে এ অনুমান অমূলক নয় যে, মধ্যযুগের ন্যায় প্রাচীন যুগে এবং তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষ স্থানীয় তন্তু হতে দড়ি তৈরি করতে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার জানত; সে ব্যবহারের পরিসরও ছিল বিস্তৃত।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার মানুষও নানান কার্যকলাপে বিভিন্ন উপকরণের ও ধরনের দড়ি ব্যবহার করত। এসব দড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়া ও নাম বৈচিত্র্যপূর্ণ– যা তাৎপর্যপূর্ণ ও বাংলার মানুষের প্রযুক্তিগত দক্ষতার পরিচায়ক। একই সাথে প্রযুক্তিকে সহজ ও সাধারণীকরণের মাধ্যমে সুলভ করে তোলার দিকেও ইংগিত করে। সম্ভবত এই কারণে ব্যবহারের পরিসর ও ধরনের ব্যাপকতা বাংলার অঞ্চলের প্রত্ন-সাহিত্য, ভৌত প্রত্ন-নিদর্শন ও প্রত্ন-শব্দে পরিলক্ষিত হয়। তবে ‘দ্যড়া’কে পেশাজীবী হিসেবে উল্লেখের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় দড়ি তৈরির আলোচ্য তিনটি হাতিয়ার (*বেলনি*, *টাকুর* ও *ট্যাঁড়া*) ব্যতীত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিশ্চয় আরও অনেক ধরনের হাতিয়ার বা প্রযুক্তি প্রচলিত ছিল বা এখনও আছে। এসব প্রযুক্তি বা দড়ির বৈচিত্র্যময় ব্যবহার কতটা প্রচীন তার প্রামাণিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে মনে হয় বাংলা অঞ্চলে মানুষের বসতি স্থাপনের শুরু থেকেই দড়ি তৈরি ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যদিও ভৌত প্রত্ন-নিদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত। আর শব্দের ব্যুৎপত্তি বিদ্যার তথ্য বিবেচনায় নিলে দড়ির সনাতন সংস্কৃতি আরও দূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাই এই অনুমান অমূলক নয় যে, আর্য সংস্কৃতি বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব থেকেই বাংলার মানুষ দড়ির বিবিধ ব্যবহার ও উৎপাদন কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল, যা সমসাময়িক বিশ্বে প্রচলিত প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। সম্ভবত দড়ির অধিকাংশ চাহিদা স্থানীয়ভাবেই পূরণ হতো এবং এই দড়ি তৈরি, ব্যবহার ও বিপণনে ব্যবহৃত উপকরণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমদানি নির্ভর নয় আরোপিতও নয়, বরং অনেকটা স্ব-উদ্ভাবিত ও পরিবেশ বান্ধব।

তথ্যনির্দেশ

---

১ এই সমস্যা সর্বত্র। শুরুতে মিশর-চর্চাও প্রাসাদ, মন্দির, সমাধি, শিলালিপিকেন্দ্রীক ছিল– প্রাচীন মিশরের সাধারণ মানুষের জীবনের ওপর মনোযোগ দেওয়া হয়নি। বর্তমানে দড়ি বা দৈনন্দিন জিনিসপত্র প্রাচীন মিশরীয়দের সামাজিক প্রেক্ষাপট, বিশেষত এসব প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ, এসবের উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সূত্র : J. C. Turner and P. van de Griend (ed.), *History and Science of Knots*, Singapore: World Scientific Publishing, 1998, (First published 1996), pp. 43 & 44.

২ J. C. Turner and P. van de Griend (ed.), *History and Science of Knots*, Singapore: World Scientific Publishing, 1998, (First published 1996).

৩ H. A. McKenna, J. W. S. Hearle and N. O’Hear, *Handbook of Fibre Rope Technology*, Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2004.

৪ K. R. Gilbert, ‘Rope-Making’, *A History of Technology, Volume I: From Early Times to Fall of Ancient Empires* (edited by Charles Singer, E. J. Holmyard and A. R. Hall), New York and London: Oxford University Press, 1954, pp. 451-455

৫ বিস্তারিত দেখুন : ইরফান হাবিব, ‘ইতিহাস-গবেষণায় প্রযুক্তি-চর্চার গুরুত্ব’, ইরফান হাবিব (সম্পা.), *মধ্যকালীন ভারত: প্রথম খণ্ড*, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৭, পৃ. ১৪-৩৮

৬ রোমিলা থাপার, ‘ক্রমাগত স্মরণ করাতে হবে’, *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা* (সাক্ষাৎকারভিত্তিক উপ-সম্পাদকীয়), ১৫ আগস্ট ২০২১ খ্রি., কলকাতা, পৃ. ৪

---

৭ ইতিহাস অনুসন্ধানে এ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত না হলেও এ যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে নীহাররঞ্জন রায় রচিত ‘ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে (নীহাররঞ্জন রায়, ‘ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি’, বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, কলিকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০, পৃ. ৭৭৯-৭৮৪)। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এক সাক্ষাৎকারেও বলেছেন, যেহেতু নিকট বা দূর অতীতের সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজে সবল বা দূর্বল অবস্থায় এখনও বিদ্যমান, এরূপ ঐতিহ্য অনুসারী দেশের ইতিহাস রচনার জন্য বর্তমান থেকে অতীতে ধাবিত হওয়া খুবই কার্যকর পদ্ধতি (Debiprasad Chattopadhyaya and Hitesranjan Sanyal, ‘An Interview with Niharranjan Ray’, in Debiprasad Chattopadhyaya (ed.), *History and Society (Essays in Honour of Professor Niharranjan Ray)*, Calcutta: K P Bagchi & Company, 1978, p. 619)। একই বিষয়ে অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*’র অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলপ্রসু প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরী নিজেও বর্তমান হতে অতীতের দিকে ধাবিত হওয়ার রীতি প্রয়োগ করেছেন তাঁর *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে (আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১২, পৃ. ৮৮, ৮৯ ও ৯৮)

৮ Dieter Kuhn, *Science and Civilisation in China. Vol. 5, Chemistry and Chemical Technology, Part IX: Textile Technology: Spinning and Reeling*, ed. Joseph Needham, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 237

৯ নওগাঁ ও পাবনায় লেখক কর্তৃক জরিপে পাটের কয়েকটি আঁশ পাক দিয়ে দড়ি তৈরির জন্য যা তৈরি করা হয়, তা তার, ত্যাঁতা, ত্যাতি, তাইত্যা নামে চিহ্নিত হয়েছে। তবে বাংলা একাডেমির বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-এ বগুড়ায় প্রচলিত ত্যাঁত্যা শব্দে অর্থ দেওয়া হয়েছে পাটের সুতলি। আবার একই অভিধান সূত্রে জানা যায়, ময়মনসিংহে তাইতা ও তাইত্তা রশি অর্থে, রাজশাহীতেও তাইত্যা রশি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক পাক বিশিষ্ট রশি বা প্রথম পাকের রশি বগুড়া ও নোয়াখালীতে লোয়া নামে পরিচিত।

১০ ‘দ্যাড়া’, *বিশ্বকোষ* (সংকলন নগেন্দ্রনাথ বসু), কলিকাতা: নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৩০৪

১১ তথ্যের উৎস : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯; *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*, ১-৫ খণ্ড, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১-২০১২; *লৌকিক শব্দকোষ* (কামিনীকুমার রায় সম্পা.), কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৬০ এবং ব্যক্তিগত সমীক্ষা ও সংগ্রহ।

১২ ওয়াকিল আহমদ, *লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি*, ঢাকা: গতিধারা, ২০১০, পৃ. ২৩

১৩ *লৌকিক শব্দকোষ* (কামিনীকুমার রায় সম্পা.), কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৬০, পৃ. ১২৮

১৪ H. A. McKenna, J. W. S. Hearle and N. O’Hear, *Handbook of Fibre Rope Technology*, Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2004, p. 36; Sara J. Kadolph, *Textiles* (Pearson New International Edition), Harlow: Pearson Education Limited, p. 28

১৫ দীপঙ্কর নস্কর, ‘লোকপ্রযুক্তি ঢেঁড়া বা টাকু ও ঝ্যাঁদলা শিল্প’, ‘সুচেতনা’ (বাংলার লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় লোকপ্রযুক্তি সংখ্যা), ২৩ বর্ষ, ৪৫তম সংকলন, পৃ. ১৬৫

১৬ George Watt, *A Dictionary of The Economic Products of India*, Vol. II, Calcutta : The Superintendent of Government Printing, India, 1889, p. 566

১৭ George Watt, *A Dictionary of The Economic Products of India*, Vol. II, *ibid*, pp. 566 & 567

১৮ আকমল হোসেন, ‘লাল ফলে রাঙা হাসি ‘উদাল’ গাছে’, *দৈনিক প্রথম আলো*, https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7cn8jricfu, 2.12.2025

১৯ বাংলা অঞ্চলে এই পদ্ধতি *জাগ* (Fermentation) দেওয়া নামে পরিচিত। বিস্তারিত দেখুন: Md. Mahbubul Islam and Md. Mujibur Rahman, ‘Advances in Jute and Allied Fibres Post-harvest Processing Technologies in Bangladesh: Adoption Constraints, Prospect and Future Thrust’, *Research WebPub*, Vol. 1(2), pp. 20-30; Md. Rostom Ali and other, ‘Jute Retting Process: Present Practice and Problems in Bangladesh’, *AgricEngInt: CIGR Journal*, Vol. 17, No. 2, pp. 243-247

২০ কলাগাছ ও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের আঁশের উৎস আবাকা একই পরিবার ও গণে অন্তর্ভুক্ত হলেও উভয়ের আঁশের মান পৃথক। আবাকা আঁশ দৃঢ়তা (strong tensile strength) ও লোনা প্রতিরোধিতার জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর অধিকাংশ ও উন্নতমানের আবাকা চাষ হয় ফিলিপাইনে। এই কারণে এর দড়ি সারা বিশ্বেই ম্যানিলারোপ

নামে বিখ্যাত। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: George Sterling Lee, ‘Abaca (Manila hemp): The Fiber Monopoly of the Philippine Islands’, *The Scientific Monthly*, Vol. 11, No. 2 (Aug., 1920), pp. 159-170

২১ বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোক প্রযুক্তি*, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪, পৃ. ৪৫

২২ নির্মলকুমার বসু, *বিয়াল্লিশের বাংলা*, কলিকাতা: অমিয়কুমার ভট্টাচার্য, ১৩৬৭, পৃ. ৫ ও ৪৭

২৩ Kunja Gobinda Goswami, *Excavations at Bangarh (1938-41)*, Calcutta: University of Calcutta, 1948, p. 8

২৪ A. Ghosh (ed.), *An Encyclopaedia of Indian Archaeology*, Vol. 2, New Delhi: Munshiram Manoharlal Pubtishers Pvt. Ltd., 1989, p. 305

২৫ Frederick M. Asher, *The Art of Eastern India, 300-800*, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1980, p. 61 (Plate 105)

২৬ Gerd J. R. Mevissen, *Ådityas, Grahas, and other Deities of Time and Space on Surya Sculptures, Predominantly from Bengal*, Kolkata: Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, 2026; Mukant Bishwas and Md. Golam Kawsar, ‘An Iconographic Study of an Unnoticed Early Medieval Surya Sculpture from Anandipur Village in Noakhali District, Bangladesh’, *Journal of History, Archaeology and Architecture*, Vol.4, No.1, pp. 1-11; Claudine Bautze-Picron, ‘Sculpture: Ancient Period’ in Lala Rukh Selim (ed.), *Art and Crafts*, Dhaka: ASB, 2007, pp. 91-109

২৭ K. N. Dikshit, *Excavations at Paharpur*, Bengal, New Delhi: Director General Archaeological Survey of India, 1999, plate XLIII (f)

২৮ Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: ICSB, 2001, (Plate C 154, 155, 681, 683, 700, 701, 704 & 876).

২৯ Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: ICSB, 2001, pp. 281, 284

৩০ Ibid, Dhaka: ICSB, 2001, p. 288.

৩১ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, *ধর্ম্মমঙ্গল*, কলকাতা: নটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪০

৩২ কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ, *মনসা-মঙ্গল*, প্রথম খণ্ড (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত), কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩, পৃ. ১৬০

৩৩ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *চণ্ডীমঙ্গল* (সম্পা. সুকুমার সেন), নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৩, পৃ. ৮৩

৩৪ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৩৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

৩৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮

৩৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৩৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

৩৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

৪০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

৪১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

৪২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

৪৩ মালাধর বসু, *শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়* (খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত), কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪, পৃ. ৮২

৪৪ ‘কচড়া’, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান : প্রথম খণ্ড* (সংক. ও সম্পা. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭

৪৫ কৃত্তিবাস, *রামায়ণ* (সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), কলকাতা : গোপীমোহন সিংহরায়, ১৩৬৩ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪

৪৬ কৃত্তিবাস, *রামায়ণ* (সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৪৭ কৃত্তিবাস, *রামায়ণ* (সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

৪৮ কৃত্তিবাস, *রামায়ণ* (সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

---

৪৯ বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত), *চণ্ডীদাসের পদাবলী*, কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬৭ (বঙ্গাব্দ), পৃ ২৪২

৫০ চণ্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* (বসন্তরঞ্জন রায় সম্পা.), কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১৯, ২২১, ৫৯০, ৫৯১, ৪৯

৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮ ও ১৬৯

৫২ যদিও *শূন্যপুরাণ*-এর লেখক রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে; পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, তিনি নবম থেকে ষোলো শতকের মধ্যে যে কোনো সময়ের মানুষ। তবে ওয়াকিল আহমদের মতে, তিনি মুসলিম বিজয়োত্তর তেরো শতকে বর্তমান ছিলেন। সূত্র : জাহারাবী রিপন, *মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যে বাংলার কৃষি-প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৫২

৫৩ রামাই পণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ* (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ও নিমাইচন্দ্র পাল সংক.), কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০

৫৪ অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, কলিকাতা: নয়াপ্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ১২৭, ১৩৬ ও ১৮৯

৫৫ তিনি প্রাচীন বাংলার গণনারীতি, বিভিন্ন ফসল ও তরিতরকারির নাম, স্থান-নাম, বাঙালির প্রধান খাদ্য প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন 'প্রাচীনতম ঐতিহাসিক' ও 'নির্ভরযোগ্য' উপাদান অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ব্যবহৃত শব্দের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে তিনি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত (Etymology) তথ্য বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, "[বাংলার] দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাবে, যে-সব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপে বর্তমান। এ ধরনের কিছু শব্দে আমাদের আহার-বিহার, বসন-ভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এ সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ হিসেবে এ শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে।" দেখুন: নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩, ৪৯, ৫১, ৪৪৩ ও ৪৪৭

৫৬ শব্দের ব্যুৎপত্তির বিশ্লেষণের প্রতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্তারিত দেখুন : ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা* (অনু. কাবেরী বসু), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯, পৃ. ১১২-১১৬। এছাড়া শব্দ কীভাবে 'Source of Clues' হতে পারে সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: David W. Anthony, *The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World,* Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2007, বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ২১-৩৮)। এ বিষয়ে Franklin C. Southworth রচিত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হলো: *Linguistic Archaeology of South Asia,* London & New York: Routledge Curzon, 2005

৫৭ এই অনুচ্ছেদের শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সকল তথ্যের উৎস: *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, *১ম খণ্ড* (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক.), নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৬৬; *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ: ব্যুৎপত্তিকোষ* (সত্যনারায়ণ দাশ), কলিকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৩; *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংক. ক্ষুদিরাম দাস), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮; *দেশী বাংলা শব্দের অভিধান* (সংক. ও সম্পা. রবিশঙ্কর মৈত্রী), ঢাকা: অনন্যা, ২০০১; T. Burrow, and M. B. Emeneau, *A Dravidian Etymological Dictionary*, Oxford: Clarendon Press, 1984

৫৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পা.), *বৌদ্ধগান ও দোহা*, কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৩

৫৯ অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, কলিকাতা: নয়াপ্রকাশ, ১৯৯৬; শামসুল আলম সাঈদ, *চর্যাপদ: তাত্ত্বিক সমীক্ষা*, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১২; সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি-পদাবলী*, বর্ধমান : সাহিত্যসভা, ১৯৫৬; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা.), *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা: ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ; পরীক্ষিত হাজরিকা, *চর্য্যাপদ*, গুয়াহাটী: ডালিমী প্রকাশন, ১৯৮৭ (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩); মণীন্দ্রমোহন বসু, *চর্য্যাপদ*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩

৬০ Manindra Bhusan Bhaduri, *A Mundari-English Dictionary*, Calcutta: Calcutta University Press, 1931

৬১ 'Rope', *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংক. ও সম্পা. কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬

---

৬২ অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭, পৃ. ২৪; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪, পৃ. ৭৬

৬৩ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯, পৃ. ১১; অতীন্দ্র মজুমদার, *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা : নয়া প্রকাশ, ১৪০৪, পৃ. ৩

৬৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ], কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃ. ২৪

৬৫ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০, পৃ. ৫৮; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৯

৬৬ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪২; অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭, পৃ. ২৬

৬৭ কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, 'প্রাক্ কথন', *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংক. ও সম্পা. কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৩১